উপন্যাস

কাশফুলের নৌকা

মুহাম্মদ সারওয়ার হুসাইন

বইঝুলি

কাশফুলের নৌকা

মুহাম্মদ সারওয়ার হুসাইন

প্রকাশনায়
বইঝুলি
শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইলঃ 01897820521

প্রকাশক
সবুজ হুসাইন
জহির উদ্দিন

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০২৭

© ২০২৬ মুহাম্মদ সারওয়ার হুসাইন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই বইয়ের কোনো অংশ লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো মাধ্যমেই—মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, ইলেকট্রনিক সংরক্ষণ, অডিও, ভিডিও বা অন্য কোনো উপায়ে—পুনঃপ্রকাশ, সংরক্ষণ বা বিতরণ করা যাবে না।

প্রচ্ছদ
সবুজ হুসাইন

মূল্যঃ ৩২০ টাকা
ISBN: 978-984-29052-8-6

অনলাইন পরিবেশক: boijhuli.shop

◆

উৎসর্গ

আমার একমাত্র ভাতিজা
সাইফুদ্দীনকে—

আল্লাহ তোমাকে সাইফুদ্দীন কুতুযের মতো সাহসী করে গড়ে তুলুন। মুসলিম উম্মাহর ওপর নেমে আসা প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ের সামনে অবিচল দাঁড়ানোর শক্তি দিন। ঈমানের দৃঢ়তা, সত্যের পক্ষে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর সাহস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর হিম্মত দান করুন।

তোমার জীবন হোক উম্মাহর কল্যাণে নিবেদিত।

আমিন।

শ্রাবণের সেই সন্ধ্যাটা ছিল অন্য সব সন্ধ্যার চেয়ে আলাদা। পশ্চিম আকাশে মেঘ জমছিল না, মনে হচ্ছিল কেউ আকাশের গায়ে কালো পাথরের দেয়াল তুলে দিচ্ছে। বাতাস থেমে গিয়েছিল। ছোট কালনীর জল স্থির, ঘোলাটে, যেন নদী নিজেই দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে।

রসুলপুর ঘাটে তখনো একটা নৌকা বাঁধা। নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক দীর্ঘদেহী মানুষ। কালো রং, চওড়া কাঁধ, মুখে অসময়ের হাসি। নাম আবদুল গনি, গ্রামের মানুষ ডাকে গনি মাঝি।

"মাঝি, আজ থাক," বলল একজন যাত্রী। তার গলায় চাপা ভয়। "আকাশের অবস্থা ভালো ঠেকছে না।"

গনি মাঝি আকাশের দিকে একবার তাকালেন। তারপর যাত্রীর চোখের দিকে। "ওপারে একজনের ছেলের অসুখ। ভোরে ঢাকা থেকে ডাক্তার আসার কথা, কিন্তু খবরটা তার কাছে পৌঁছাবে কে?"

"কাল গেলে হয় না?"

"কাল পর্যন্ত যদি ছেলেটা না টেকে?" মাঝি গামছা কোমরে শক্ত করে বাঁধলেন। সেই গামছায় ছোট একটা পুঁটলি, ভেতরে সতেরোটি টাকা। "কথা দিয়েছি ভাই। মাঝির কথা নদীর মতো, একবার ছাড়লে আর ফেরে না।"

তিনি বৈঠা তুলে নিলেন। নৌকা ঘাট ছেড়ে এগোল। আর মাঝনদীতে পৌঁছানোর আগেই গনি মাঝি শিস দিতে শুরু করলেন, সেই চেনা, সুরহীন, নির্ভয় শিস। ঘাটে দাঁড়ানো বারো ছুঁই ছুঁই বয়সের একটা রোগা ছেলে সেই শিসের শব্দ শুনল, যতক্ষণ না বাতাসের গর্জনে তা ডুবে গেল।

সেই ছেলেটিই এই কাহিনীর কেন্দ্র। তার নাম বদরুজ্জামান, কিন্তু রসুলপুরের কেউ তাকে ওই নামে ডাকে না। সবাই বলে বদু।

নৌকা ওপারে পৌঁছেছিল। সব যাত্রী নিরাপদে নেমেছিল। ফেরার পথে ঝড় নামল, আর গনি মাঝি ফিরলেন না।

◆

এবার সেই ঝড়ের এক বছর পরের কথা। বদুর বয়স এখন বারো ছুঁই ছুঁই, কিন্তু দেখায় আটের মতো। কারণ সে রোগা। রোগা হওয়ার পেছনে অবশ্য বড় কোনো কারণ নেই, সে খেতে বসলে আধপেটা খেয়েই উঠে যায়। মা বলেন, "ভাত খা

বদু।" সে বলে, "খিদা নাই মা।" খিদা তার আছে, কিন্তু সে জানে ঘরে ভাত কম।

এইটুকু একটা ছেলে এত কিছু জানে কীভাবে, এই প্রশ্ন আপনি করতেই পারেন। উত্তরটা সহজ। দারিদ্র্য মানুষকে বয়সের আগেই বড় করে দেয়। এটা তার একমাত্র দয়া।

গ্রামের নাম রসুলপুর। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট কালনী নদী। নাম ছোট, কিন্তু ভাদ্র মাসে তার মেজাজ বড় নদীর মতো। দুকূল ছাপিয়ে জল ওঠে, ঘোলা জলে কচুরিপানা ভেসে যায়, আর ওপারের কাশবনটা দূর থেকে দেখায় যেন কেউ সবুজ কাপড়ে সাদা ফুলের নকশা তুলেছে। গাঁয়ের বুড়োরা বলে, এই নদী ভালোও বাসে, ভয়ও দেখায়। ঠিক যেমন কিছু মানুষ।

আজ অপরাহ্নে বদু বসে আছে ঘাটের শিমুল গাছটার নিচে। তার হাতে একটা পুরনো টিনের কৌটা। কৌটার গায়ে লেখা ছিল 'ডালডা'। লেখাটা এখন প্রায় মুছে গেছে। কৌটাটা সে বারবার কানের কাছে নিয়ে ঝাঁকায়। ভেতরে ঝনঝন শব্দ হয়।

শব্দটা তার খুব প্রিয়। কারণ শব্দ মানেই কিছু আছে। যে কৌটা একদম খালি, সে চুপ করে থাকে।

ঘাটে নৌকা বাঁধা। নৌকার মাঝি জহির চাচা গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর নাক ডাকার শব্দে মনে হয়, দূরে কোথাও কেউ করাত চালাচ্ছে।

"বদু, ও বদু!"

বদু চমকে তাকাল। কৌটাটা চট করে গামছার নিচে লুকিয়ে ফেলল। ডাকছে তার বোন রুপা। বয়স ষোলো। গায়ের রং শ্যামলা, চোখ দুটো বড়, আর হাসলে বাঁ গালে একটা টোল পড়ে। গ্রামের লোকে বলে, রুপার হাসি দেখলে মনে হয় সকালবেলার রোদ।

"কী করস এইখানে?"

"কিছু করি না।"

"কিছু না করলে হাতে কী লুকাইলি?"

"কিছু না।"

রুপা এগিয়ে এসে বদুর পাশে বসল। কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না। নদীর ওপারে একটা বক উড়ে গেল। জলের ওপর তার ছায়াটা কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে গেল, তারপর মিলিয়ে গেল।

"বদু।"

"হুঁ।"

"আমার বিয়া ঠিক হইছে। শুনছস?"

বদু শুনেছে। গ্রামে কোনো খবরই চব্বিশ ঘণ্টার বেশি লুকিয়ে থাকে না। সে শুধু বলল, "হুঁ।"

"পাত্র কাঁঠালিয়ার। জমিজমা আছে। মানুষটা শুনছি ভালো। একটু বয়স হইছে, এই যা। আগের ঘরে চার বছরের এক ছেলে আছে।"

"কত বয়স?"

"ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হইব।"

বদু মনে মনে হিসাব করল। ষোলো আর পঁয়ত্রিশের মধ্যে ফারাক উনিশ। সে ভাবল, এত বড় ফারাক নিয়ে মানুষ কীভাবে সংসার করে? কিন্তু মুখে কিছু বলল না। কারণ রুপার চোখ তখন নদীর দিকে। সেই চোখে জল নেই, কিন্তু জল জমার আগের থমথমে ভাবটা আছে।

নদীর জলে একটা কচুরিপানার ঝাড় ভেসে যাচ্ছিল। তার মাথায় একটা বেগুনি ফুল। বদু সেদিকে তাকিয়ে ভাবল, ফুলটা জানে না সে কোথায় যাচ্ছে। জানলে হয়তো এত সুন্দর করে ফুটে থাকত না।

◆

ঘাটে যিনি শিস দিতে দিতে নৌকা বাইতেন, সেই গনি মাঝিই ছিলেন বদুর বাবা। মানুষটা ছিলেন লম্বা, কালো, আর হাসিখুশি। তাঁর একটাই দোষ ছিল। তিনি কথা দিয়ে ফেলতেন, আর কথা দিলে সেটা রাখার জন্য নিজের প্রাণ দিতেও রাজি থাকতেন।

সেই শিসের কোনো নির্দিষ্ট সুর ছিল না। ছিল কেবল নিজের মনের সুর। যাত্রীরা বলত, গনি মাঝির নৌকায় উঠলে ভয় লাগে না। কারণ যে মানুষ শিস দিতে পারে, সে নদীকে ভয় পায় না, আর নদীও তাকে ভয় দেখাতে লজ্জা পায়।

ঝড়ের তিন দিন পর নদীর একটা বাঁকে তাঁর লাশ পাওয়া গেল। গ্রামের লোক কাঁদল। যারা কখনো তাঁর নৌকায় ওঠেনি, তারাও কাঁদল। মনসুর সাহা ধুতি পরে জানাজায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মুখে কথা নেই। মজনু ফকির শুধু একবার বলেছিলেন, "নদী সব ফিরায়া দেয়। কেবল সময় নেয় না।" কেউ বুঝল না তার মানে কী।

তাঁর কোমরে গামছায় বাঁধা ছিল একটা ছোট পুঁটলি। পুঁটলির ভেতরে সতেরো টাকা, ভেজা, কিন্তু অক্ষত।

সেই টাকার কথা বদু ছাড়া কেউ জানত না।

কারণ মৃত্যুর দুই সপ্তাহ আগে এক রাতে গনি মাঝি বদুকে নিয়ে বসেছিলেন উঠানে। আকাশে তখন একফালি চাঁদ। বাতাসে হাসনাহেনার গন্ধ। তিনি বলেছিলেন, "বদু, একটা গোপন কথা কই। কাউরে কইস না।"

"কমু না আব্বা।"

"তোর বুবুর বিয়া হইব একদিন। আমি আগেই ঠিক কইরা রাখছি, বিয়ার দিন তারে লাল টুকটুক একটা শাড়ি দিমু। হাটে দেখছি। মনসুর সাহার দোকানে। সতেরো টাকা দাম।"

"এত টাকা?"

"হ, অনেক টাকা। কিন্তু বোনের বিয়া তো একবারই হয় রে বাবা।"

তারপর তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। শেষে বললেন, "তুই মনে রাখিস, বদু। আমি যদি না থাকি, তুই মনে রাখিস।"

বদু তখন বুঝতে পারেনি, এই কথাটা বাবা কেন বলছেন। এখন সে বোঝে।

কিন্তু সতেরো টাকা তো ভিজে গিয়েছিল নদীর জলে, আর মা সেই টাকায় কেনা চালে পুরো একটা মাস চালিয়েছেন। শাড়ির কথা ওঠেইনি। বদু ঠিক করেছে, শাড়ির কথা সে একাই মনে রাখবে। এবং শাড়িটা সে একাই কিনবে।

সেদিন রাতে বাবার মৃত্যুর পর প্রথমবার সে একা কেঁদেছিল। শব্দ না করে। কান্নারও একটা শিল্প আছে, যা শেখে সেই শিশু, যে জানে তার কান্না শুনলে আরেকজন আরও কাঁদবে।

কৌটাটা বদুর ধনভাণ্ডার। তার ভেতরে এ পর্যন্ত জমেছে চার টাকা ছয় আনা।

এই অর্থ সে জোগাড় করেছে নানা উপায়ে। কখনো বিলে শামুক তুলে বিক্রি করে। কখনো হাটবারে কলাপাতা বিক্রি করে। একবার সে পথে একটা আনি কুড়িয়ে পেয়েছিল। সেদিন সে সারা রাত ঘুমাতে পারেনি, ভেবেছিল আনিটা বুঝি কারও কাছ থেকে চুরি করা হলো। শেষে ভোরবেলা গিয়ে মসজিদের দানবাক্সে রেখে আসতে চেয়েছিল। ঠিক তখনই মনে পড়ল, সতেরো টাকার কথা। আনিটা ফিরে এল কৌটায়।

সে নিজেকে বোঝাল, আল্লাহ জানেন সে কার জন্য এই টাকা জমাচ্ছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই বুঝবেন।

আজ বিকেলে ঘাটে বসে সে হিসাব করছিল। বিয়ের তারিখ আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ। হাতে আছে ছয় সপ্তাহ। সতেরো টাকার মধ্যে চার টাকা ছয় আনা জমেছে। বাকি বারো টাকা দশ আনা।

ছয় সপ্তাহে বারো টাকা দশ আনা। সে নিজের মনে বলল, "অসম্ভব।"

"কী অসম্ভব রে খোকা?"

বদু আরেকবার চমকাল। এবার তার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক মানুষ, বয়সে তরুণ, অথচ দেখলে মনে হয় বুড়ো। পরনে ময়লা সাদা লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া চাদর, মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মতো কিছু একটা মালা। এঁর নাম মজনু ফকির। গ্রামের লোকে তাঁকে বলে পাগলা ফকির। কেউ কেউ বলে, তিনি পাগল নন, তাঁর চোখ কেবল এমন কিছু দেখে, যা আমাদের চোখ দেখে না।

"কিছু না চাচা।"

"কিছু না হইলে মুখ এমন কালো ক্যান? কিছু না হইলে মানুষ ঘাটে বইসা টাকা গোনে না।"

বদু অবাক হয়ে তাকাল। ফকির কীভাবে জানলেন?

ফকির মৃদু হাসলেন। "আমি জানি না রে খোকা। আমি কেবল আন্দাজ করি। তুই কৌটা ঝাঁকাইতেছিলি, আমি শব্দ শুনছি। শব্দ শুইনাই বুঝছি, ভেতরে যা আছে তা কম। বেশি টাকা থাকলে শব্দটা অন্যরকম হয়। আরও ভারী, আরও গম্ভীর।"

বদু কিছু বলল না। ফকির তার পাশে বসে পড়লেন। অনেকক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তুই কি জানস, কাশফুল কেন সাদা?"

"না।"

"কাশফুল সাদা কারণ সে আকাশের কাছে মেঘ ধার করছে। শরতের শেষে আকাশ যখন মেঘ ফেরত চায়, কাশফুল তখন ঝইরা পড়ে। দেনা শোধ হইয়া যায়।"

"এইটা কি সত্যি চাচা?"

"সত্যি-মিথ্যা জানি না। আমার শুনতে ভালো লাগে, তাই বিশ্বাস করি।"

বদু কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, "চাচা, আমি যদি ছয় সপ্তাহে বারো টাকা দশ আনা জোগাড় করতে না পারি, তবে?"

ফকির তার দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর চোখে একটা অদ্ভুত নরম আলো। বললেন, "তবে কাশফুলের কাছে ধার চাইবি।"

"কাশফুল কি টাকা দেয়?"

"টাকা দেয় না রে খোকা। দেয় অন্য জিনিস। যা টাকা দিয়া কেনা যায় না।"

বদু বুঝল না। ফকির উঠে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় একটা কথাই বললেন, ধীরে, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছিলেন, "নৌকা ভাসে, মানুষ ভাসে, শুধু ভালোবাসা ডোবে না।"

সন্ধ্যা নামছিল। ওপারের কাশবনে শেষ রোদটুকু আটকে আছে। বদু কৌটাটা বুকে চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল। বাড়ি ফেরার পথে সে ঠিক করল, আগামীকাল ভোরে সে যাবে হাটে। মনসুর সাহার দোকানে। একবার নিজের চোখে দেখবে সেই শাড়িটা।

শাড়ি, যার রং লাল টুকটুকে, যার দাম সতেরো টাকা।

◆

সেই রাতে বদু ঘুমাতে পারল না। ফকিরের কথাগুলো মাথার ভেতর ঘুরছিল। নৌকা ভাসে, মানুষ ভাসে, শুধু ভালোবাসা ডোবে না। কেন একজন মানুষ এমন করে কথা বলে? কেন গ্রামের লোকে তাঁকে পাগল বলে, অথচ তাঁর কথা শুনলে কারও হাসি পায় না?

সে উঠে মায়ের কাছে গেল। সখিনা বেগম তখনো জেগে, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে সুপারি কাটছেন।

"মা, মজনু চাচা কে?"

মা হাতের সরতা থামালেন। একবার ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর আবার সুপারির দিকে। "কেন জিজ্ঞেস করস?"

"উনি আজ আমারে কাশফুলের কথা কইলেন। আমি বুঝি নাই।"

"সব কথা বুঝতে নাই।" মা কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, "বস। বলতেছি। একটাই কথা, কাউরে কইস না। উনি চান না।"

বদু মায়ের পাশে বসল।

◆

মজনু ফকিরের আসল নাম ছিল মজনু মিয়া। বাড়ি পাশের গ্রাম সোনাপুরে। বাবা ছিলেন ছোট গৃহস্থ, ছেলেটাকে পড়ালেখায় দিয়েছিলেন প্রাণ দিয়ে। মজনু ছিল মেধাবী। স্কুল শেষ করে সে গেল ঢাকায়, কলেজে। গ্রামের লোক তখন বলত, এইবার একটা ছেলে মানুষ হবে।

কলেজে পড়ার সময় সে একদিন বাড়ি এল ছুটিতে। গ্রামের ছেলেদের সে বলেছিল, একটা কথা শোনো। আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা। এই ভাষায় আমরা কথা বলি, গান গাই, কাঁদি। কিন্তু ওরা বলছে, এ দেশের ভাষা হবে উর্দু। আমরা কি তা মানব?

সেদিন গ্রামের কেউ পুরোপুরি বোঝেনি। কিন্তু মজনুর চোখ জ্বলছিল।

সেটা ছিল একান্নর শেষ। তারপর এল বাহান্ন।

একুশে ফেব্রুয়ারি সে ঢাকায় ছিল। মেডিক্যাল কলেজের সামনে ছাত্ররা মিছিল করে এগোচ্ছিল। মজনু তাদের মধ্যে ছিল। হাতে কোনো অস্ত্র নেই, কেবল গলা। তারা গাইছিল, চিৎকার করছিল, দাবি করছিল। তারপর গুলি চলল।

সে নিজের চোখে দেখল, তার ঠিক সামনে, তার বন্ধু একজন, যে কিছুক্ষণ আগেও তার হাত ধরে হাসছিল, রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। রক্ত। অজস্র। পিচঢালা পথ লাল হয়ে গেল। মজনু হাঁটু গেড়ে বসে তার বন্ধুকে ঝাঁকাল, আর বন্ধু চোখ খুলে একবার শুধু বলল, "মজনু, আমাগো ভাষা..." তারপর আর কিছু বলল না।

◆

"সে ফিরে এল গ্রামে," সখিনা বেগম বললেন। "পায়ে হেঁটে। সাত দিন লাগছিল। তখন রুপা সবে সাতে পড়েছে, আর তুই তিন বছরের কোলের ছেলে, তোর কিছু মনে থাকার কথা না। আমি তারে দেখছিলাম, এক ভোরে, ঘাটে এসে বসছে। কিছু কয় না। কারও দিকে তাকায় না। শুধু নদীর দিকে চাইয়া থাকে।"

"কতদিন?"

"এক বছর। সারা বছর একটা কথাও কয় নাই। তার বাপ-মা কাঁদত, ওঝা আনত, কবিরাজ আনত। কিন্তু সে শুধু নদীর দিকে চাইয়া বইসা থাকত।"

"তারপর?"

"তারপর এক শরতে, কাশফুল ফুটার সময়, সে প্রথম কথা কইল।" মা একটু হাসলেন। "আমি তখন ঘাটে কাপড় কাচতেছিলাম। সে আমার দিকে তাকাইয়া কইল, 'ভাবি, কাশফুল সাদা কেন জানো?'"

বদুর গায়ে কাঁটা দিল। "কী কইলেন?"

"আমি কইলাম, না। সে কইল, 'কাশফুল সাদা কারণ সে আকাশের কাছে মেঘ ধার করছে।' তারপর সে ফের চুপ হইয়া গেল।"

বদু অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না। শেষে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "উনি কি পাগল মা?"

সখিনা বেগম সুপারি রেখে ছেলের দিকে ফিরলেন। তাঁর চোখে অদ্ভুত নরম আলো। "আমি জানি না রে বদু। কিন্তু আমি একটা কথা জানি। যে মানুষ এত বড় দুঃখ দেখছে, তার মাথার ভেতরে দুনিয়াটা আর আমাগো মতো সোজা থাকে না। সে সব কিছুতে আরেকটা মানে খোঁজে। কাশফুলে, নদীতে, আকাশে। কারণ সরাসরি যা দেখছে, তা সে সইতে পারে নাই।"

"তাইলে ওইসব কথা... সত্যি?"

"সত্যি-মিথ্যা বলা কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয়, ওইসব কথা তার ঔষধ। যেমন তোর বাপের শিস আছিল আমার ভয়ের ঔষধ।" মা আবার সুপারি তুললেন। "ঘুমা যা। কালকে ভোরে ওঠা লাগব।"

বদু উঠে নিজের ঘরে গেল। কিন্তু বিছানায় শোয়ার আগে সে জানালার কাছে দাঁড়াল। বাইরে চাঁদ নেই। শুধু তারা, আর দূরে ঘাটের কাছে শিমুল গাছের

কালো ছায়া। আর সেই ছায়ার নিচে, একটা মানুষের আকার, চুপচাপ বসে, নদীর দিকে মুখ করে।

মজনু ফকির। এই রাতেও।

বদুর মনে হলো, সে এখন তাঁকে অন্য চোখে দেখছে। একজন বুড়ো-হয়ে-যাওয়া তরুণ, পাগল নয়, একজন মানুষ, যে একদিন এক রাস্তায় এক বন্ধুর শেষ কথা শুনেছিল, আর সেই কথা সারা জীবন বয়ে বেড়াচ্ছে। ভাষা। আমাদের ভাষা।

সে ঠিক করল, কোনো এক ভোরে ফকিরের পাশে গিয়ে চুপচাপ বসবে। কিছু বলবে না। শুধু বসবে। কারণ কিছু দুঃখ আছে, যার জন্য শব্দের চেয়ে বড় উপহার হলো পাশে বসে থাকা।

এই কথা সে তখনো ভালো করে জানত না। জানবে আরও কিছুদিন পর, এক রাতে, রুপার বন্ধ দরজার ওপাশে বসে।

◆

শুক্রবারে হাট বসে ফতেপুরের বড় বটতলায়। রসুলপুর থেকে হাঁটা পথে দেড় ঘণ্টা। বদু রওনা দিল প্রত্যুষে, যখন আকাশের রং ঠিক কোন দিকে যাবে তা নিয়ে সূর্য নিজেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। পূর্ব দিগন্তে একটা ফ্যাকাশে কমলা রেখা, মাথার ওপর তখনো দু-একটা তারা, আর পথের দুপাশে ধানক্ষেতের ওপর শিশিরের আস্তরণ। পায়ে জুতো নেই। জুতো তার কোনোকালেই ছিল না। এ নিয়ে তার দুঃখও নেই। যে জিনিস ছিল না, তার জন্য দুঃখ করা যায় না। দুঃখ করতে হয় যা ছিল এবং হারিয়ে গেছে, তার জন্য।

পথে একটা খাল পড়ল। খালের ওপর বাঁশের সাঁকো, মাঝখানটা দুলে ওঠে। বদু সাঁকোর মাঝখানে এসে দাঁড়াল। নিচে জল স্থির, কালো, আর সেই জলে আকাশের একটা টুকরো ধরা পড়ে আছে। সে ভাবল, আব্বা হলে এখানে শিস দিতেন। সে নিজে শিস দেওয়ার চেষ্টা করল। বাতাস বেরোল, কিন্তু সুর বেরোল না।

হাটে পৌঁছে চারদিকে চোখ পড়ল তার। কী না আছে এখানে! বেগুনের স্তূপ, কাঁচা মরিচের ঝুড়ি, তাজা ইলিশের ঝকঝকে রুপোলি ঢেউ। এক কোণে একজন লোক টিনের চোঙা মুখে দিয়ে কবিরাজি তেল বেচছে, আর বলছে, "এই তেল

মাখলে খোঁড়া হাঁটে, কানা দেখে, আর বউ ঝগড়া বন্ধ করে।" আরেক কোণে জিলাপির কড়াইয়ের সামনে ভিড়, ধোঁয়া উঠছে, গন্ধে চারপাশ ম ম করছে।

বদু জিলাপির দিকে এক পলক তাকাল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল। তার লুঙ্গির খুঁটে সামান্য কয়েকটা পয়সা বাঁধা ছিল, কিন্তু সেগুলো জিলাপির জন্য নয়। এই সংকল্প নেওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু যে ছেলে একবার সংকল্প নেয়, সে জানে, সংকল্পের প্রথম পরীক্ষা সবসময় ক্ষুধার মধ্য দিয়েই আসে।

সে প্রথমেই গেল মনসুর সাহার দোকানে।

দোকানটা ছোট, কিন্তু মনসুর সাহা মানুষটা বড়। বড় মানে চওড়ায়। তিনি যখন গদিতে বসেন, মনে হয় গদিটাই তাঁর শরীরের একটা অংশ। তাঁর একটা অভ্যাস আছে, কথা বলার আগে তিনি তিনবার গলা খাঁকারি দেন। প্রথমবার গলা পরিষ্কারের জন্য, দ্বিতীয়বার গাম্ভীর্যের জন্য, তৃতীয়বার কেন, তা তিনি নিজেও জানেন না।

বদু দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। শাড়িটা ঝুলছিল দোকানের মাঝখানে, একটা বাঁশের আড়ায়। লাল রঙ, পাড়ে সোনালি সুতার সরু রেখা। ভোরের আলো পড়ে সেটা এমন জ্বলছিল, যেন কেউ আগুনকে ভাঁজ করে ঝুলিয়ে রেখেছে।

"কী চাস?" মনসুর সাহা বললেন। তিনবার গলা খাঁকারি দিয়ে।

"ওই শাড়িটার দাম কত চাচা?"

"কোনটা? লালটা?"

"জি।"

"আঠারো টাকা।"

বদুর বুকের ভেতর কী যেন একটা পড়ে গেল। শব্দ হলো না, কিন্তু সে টের পেল। "আব্বা কইছিল সতেরো।"

"তোর আব্বা কবে কইছিল?"

"গত শ্রাবণে।"

"গত শ্রাবণে সুতার দাম কম ছিল রে বাবা। এখন বেড়েছে। বাজারের হাল তুই বুঝবি না।"

বদু বুঝল না। সে শুধু বুঝল, আরও এক টাকা লাগবে। সে সাহস করে বলল, "চাচা, শাড়িটা কি আমার জন্য একটু তুইলা রাখবেন? বিয়ার আগে আমি টাকা নিয়া আসমু।"

মনসুর সাহা এবার গলা খাঁকারি দিলেন চারবার। এটা নতুন। "তুই কার ছেলে?"

"আবদুল গনি মাঝির।"

চারবারের জায়গায় এবার তিনি অনেকক্ষণ কিছুই করলেন না। সামনে রাখা হিসাবের খাতাটা তিনি খুললেন, বন্ধ করলেন, আবার খুললেন। তারপর বললেন, "গনি মাঝি আমার কাছে একটা টাকা ধারি রেখে গেছিল। গত বছর। কোনোদিন শোধ করে নাই।"

বদুর মুখ শুকিয়ে গেল। "আমি দিমু চাচা। আমি সব দিমু।"

"তুই দিবি কেমনে? তুই তো একটা..." তিনি থেমে গেলেন। বদুর দিকে তাকালেন। বারো ছুঁই ছুঁই বয়সের একটা রোগা ছেলে, যার চোখে বিহ্বলতা নেই, আছে এক ধরনের অদ্ভুত স্থিরতা। ছোট মানুষের চোখে এমন স্থিরতা দেখলে বড়দের অস্বস্তি হয়।

"ঠিক আছে," তিনি অবশেষে বললেন। "রাখলাম। আশ্বিনের পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত। তার পর আর না।"

"আর ওই এক টাকাটা?"

"কোন এক টাকা?"

"আব্বার ধার।"

মনসুর সাহা জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "ওই টাকার কথা আমার মনে নাই। বুড়া হইছি। স্মৃতিশক্তি দুর্বল।"

বদু বুঝতে পারল না, সে কি ধন্যবাদ দেবে। কিন্তু ধন্যবাদ দেওয়ার আগেই মনসুর সাহা ঘোষণা করলেন, "যা, ভাগ। কাস্টমার আসতেছে।"

কোনো কাস্টমার আসছিল না। রাস্তা ফাঁকা। কিন্তু বদু বুঝল, মানুষটা তাকে লজ্জা থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছেন। সে দৌড় দিল।

ফেরার পথে সে একবার থামল জিলাপির দোকানের সামনে। এবার একটু বেশিক্ষণ। জিলাপিওয়ালা তার দিকে তাকিয়ে বলল, "কিনবি?" বদু মাথা নাড়ল।